দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বর্ণকুমারী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও সাহিত্যকীর্তি ঃ পারিবারিক পরিবেশ, সমসাময়িক নারী আন্দোলন ও নারী চেতনার প্রেক্ষিতে স্বর্ণকুমারীর অবস্থান

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই বছরই বাংলার বিধবা মেয়েদের বাঁচার পথ তৈরি হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। বাংলা ভাষায় মেয়েদের লেখা প্রথম বই কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল এই বছরেই। আর এই ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়েছিল জোঁড়াসাকোঁর ঠাকুর পরিবারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা দেবীর পঞ্চম কন্যা এবং একাদশ সন্তান ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

জন্মসূত্রে স্বর্ণকুমারী পেয়েছিলেন এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, যা তাঁর গড়ে ওঠার সহায়ক হয়েছিল। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে ঠাকুরপরিবারের সদস্যদের উনিশ শতকের বাংলার প্রগতিশীল আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দ্বারকানাথ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'র সদস্য। এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল জাতিভেদ সমস্যা, বহুবিবাহ, বাল বিধবা, সতীদাহ সমস্যা ইত্যাদি। আধুনিক যুগের সূচনায় ইউরোপে অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে যে মিলন গড়ে উঠেছিল, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'আত্মীয়সভা'য়। স্বর্ণকুমারীর পিতা মহির্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিবারকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে উৎসাহী ছিলেন। পিতার স্বকীয় চিন্তাধারায় স্বর্ণকুমারীদের ভাইবোনদের প্রতিভা উৎসারিত হয়েছিল—

> পিতৃদেবকে ধর্মাত্মা ও ধর্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম ও সামাজিক আচার পৃথক বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্ম সংস্কারের সহিত যে পরিমাণ সমাজ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজ-সংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্ম সংস্কারের ন্যায় সমাজ-সংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইহার দ্বারাই যে সর্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্যবিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমনকী মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছেদ পরিবর্তন সংকল্পেও যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন তাহা আমরাই বলিতে পারি। রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে,

কিন্তু সমাজ-সংস্কারে যে পিতৃদেব বঙ্গের সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবারের মেয়েরা বাইরের জগতের স্পর্শ পায়নি সেসময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কন্যা এবং বধূরা এক স্বতন্ত্র জীবন কাটিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর পিতামহী দিগম্বরী দেবী রোজ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ের পুঁথি পাঠ করতেন। স্বর্ণকুমারীর লেখা থেকে জানা যায়—

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরানীতো কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত-রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোনো না-কোনো দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা মায়ের বুড়িমা, তিনি তো পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির তো কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির মতো কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোনো বই না পাইলে শেষে অভিধান-খানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়োদাদা মহাশয়ের ''তত্ত্ববিদ্যা''র সমঝদার তাঁর মতো আর কেহ ছিল না। মাসিমা দিদি, বধূ ঠাকুররানিগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনানো আমার একটা বিশেষ কার্য ছিল।[২]

ঠাকুরবাড়ির দুই প্রধান পুরুষ প্রিন্স দ্বারকনাথ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিবারের অন্তঃপুরে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির যে বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন তার ফলে একটু একটু করে অর্গলমুক্তির আস্বাদ পেয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকারা—

কাগজপত্রে খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে না গিয়ে রেনেসাঁসের সমসাময়িক ঘটনাগুলোর ওপর হালকা নজর বুলিয়ে নিলে দেখা যাবে তখনও তেমন কোনো সমবেত চেষ্টা শুরু হয়নি। সর্বত্র শুধু তামসী রাতের গাঢ় ছায়া। তারই মধ্যে এখানে সেখানে দু-একটি প্রদীপ সবে জ্বলেছে, কোথাও বা সলতে পাকাবার আয়োজন চলছে। কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার মধ্যে কোনো যোগ নেই। নবজাগরণের পটভূমি থেকে ঠাকুরবাড়িকে সরিয়ে নিলে এই হবে সেকালের বাংলাদেশের খাঁটি ছবি। এইরকম দু'একটা প্রদীপের আলো সম্বল করে আমাদের জীবনে নব্য রেনেসাঁস কি আজকের রূপ নিয়ে আসতো, না চৈতন্য রেনেসাঁসের মতো স্মৃতি হয়ে থাকতো কে জানে? সেইসব দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। আমরা শুধু বলতে চাই

যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতের যুগে ঠাকুরবাড়িতেই প্রথম একটা সহিষ্ণু সমবায়িতার ক্ষেত্র গড়ে উঠে।[৩]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম কন্যা সৌদামিনী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমুদিনীকে বেথুন স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী স্কুলে যাননি। কিন্তু বাড়িতে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা তাঁর জীবনের সফলতার সহায়ক হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী লিখেছেন—

It was my loving father, Maharshi Devendranath Tagore, who had prepared me for my life's career by giving me an education unusual for Hindu girls of those days.[৪]

স্বর্ণকুমারীদের ভাইবোনদের এক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে ছিল মেজকাকিমা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী যোগমায়া দেবীর সঙ্গে—

মালিনী আসতো বটতলা থেকে ছাপা বইয়ের পসরা নিয়ে। সেখান থেকে বেছে বেছে বই কিনতেন মেয়েরা। নরনারী, লায়লা-মজনু, হাতিমতাই, আরব্য উপন্যাসের গল্প, ল্যাম্বস টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ— সবই জোগাড় করেছিলেন যোগমায়া। তাঁর স্বামীর লেখা কাব্যোপন্যাস 'কামিনীকুমার'ও থাকতো মালিনীর পসরায়। আর থাকতো মানভঞ্জন, প্রভাব মিলন। কোকিল দূত, অন্নদামঙ্গল, গোলেবকাত্তলী, বাসবদত্তার মতো কিছু বই। যোগমায়া বেশ ভালো বাংলা জানতেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী'।[৫]

লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় এবং স্বর্গে যাওয়া যায় না এই ভয় সেদিন সারদা, যোগমায়াদের করতে হয়নি। ঠাকুরপরিবার 'পিরালী' ব্রাহ্মণ হওয়ায় ব্রাহ্মণ সমাজে তারা অনেকটা একঘরে ছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় দূরত্ব আরও বেড়ে যায়—

সমাজের অন্যান্য বাধা এ বাড়িতে শেকলের বাঁধন হয়ে ওঠেনি বরং তারই মধ্যে একটু ফাঁক রেখে গেছে। শৈথিল্যের অবকাশে গড়ে উঠেছিলো ঠাকুরবাড়ির একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতি, সকলের নকল করা নয়, নিজেরা নতুন কিছু করা।[৬]

এমন একটি সুন্দর আবহাওয়ায় স্বর্ণকুমারীর জীবন বিকশিত হচ্ছিল যে সময় বাংলার অধিকাংশ পরিবারের মেয়েদের শৈশব বলে কিছু ছিল না। পিতামাতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন—

ভোর হইতে না হইতে উঠিয়া বাগানে ফুল তুলিতে যাইতাম, কেহ আসিবার আগেই আঁচল ভরিয়া বাগানের যত ভাল ভাল ফুলগুলি তুলিতাম। তখন কোন বিলাতী ফুলের চাষ আমাদের বাগানে ছিল না। যতরকম দেশীয় সুগন্ধে পুষ্পে বাগান ভরিয়া থাকিত। ভোরের বেলা মৌমাছির দল তাহার উপর গুনগুন করিয়া বেড়াইত। সেই অস্পষ্ট ঊষালোকে এই সুন্দর দৃশ্য আমার মনের মধ্যে ভারী একটা সুখের মোহ রচনা করিত। আমি ঘরে আসিয়া আঁচলের ফুলগুলি একখানি থালায় সাজাইয়া

লইতাম পরে মাতৃদেবীর কাছে আসিয়া ফুলভরা মালাখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিতাম। কোন ভাল ফুল তাহাকে দিতে গেলে তিনি লইতেন না, একবার হাতে লইয়া হাসিয়া আবার তাহা থালায় রাখিয়া দিতেন।... দুজনে দুজনের মনের ভাব বুঝিতাম।... ৭ টার সময় উপাসনার পর পিতৃদেব তেতলায় যাইতেন। তিনি সহাস্যে থালাটি গ্রহণ করিয়া ফুলগুলি অঘ্রাণ করিতেন, আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিত।[৭]

পিতার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের কথা তাঁর রচিত অনেক গল্প-উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্ত্রী শিক্ষার অনুরাগী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কন্যাদের সাথে সাথে পুত্রবধূদেরও সমানভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী 'সাহিত্য স্রোত' গ্রন্থে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

পরবর্তীকালে আমরা তাঁহার শিশু কন্যাগণ বাংলা শিক্ষার সহিত সংস্কৃতও শিক্ষা পাইতাম, অধিকন্তু পিতৃদেব আমাকে ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করিতে শিখাইতেন। তাঁহার বিবাহিতা কন্যাও পুত্র বধূদিগকে ভালরূপে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দানের জন্য তিনি পণ্ডিত নিযুক্তি করিয়াছিলেন এবং ইংরাজি শিক্ষার জন্য মেমও নিযুক্ত ছিলেন। ... উপাসনান্তে প্রায় তিনি ধর্মবিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেন। অল্পবয়স্ক বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যার প্রত্যেক কথাটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে না পারিলেও আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতাম। মন যেন একটা স্বাভাবিক ধর্মভাবে উত্তেজিত হয়িা উঠিত। ... তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরলভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমা দিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত।[৮]

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অপরাধে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত ব্রাহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবী কিছুদিন ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন। কেশবচন্দ্র এবং স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সহপাঠী। কেশবদম্পতির উপস্থিতি শিশু স্বর্ণকুমারীর মনকে সেদিন গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কেশববাবু সস্ত্রীক আমাদের বাড়ি আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেদিন জোড়াসাঁকো ভবনে একটি পর্ব্বোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। যেন বহু পুরাতন আত্মীয়ের সহিত সেদিন আমাদের পুনর্মিলন ঘটিল। কেশববাবুর স্ত্রীর ভারি একটি অমায়িক মধুর মুখশ্রী ছিল। আমি যদিও তখন মাত্র ছয় বৎসরের বালিকা তথাপি তাঁহার সেই রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সর্বদা তাহার কাছাকাছি থাকিতে আমার বড় ভাল লাগিত। তিনি দিদিদের সহিত গল্প করিতেন আমি চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রীতি আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত।... (কেশবচন্দ্র) বেশ গল্প করিতে পারিতেন। দেখা হইলেই আমরা গল্পের জন্য তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতাম। তাঁরও গল্পের ভান্ডার কখনো ফুরাইত না।[৯]

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে বহিরাগত পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রেই প্রথম ঠাকুরপরিবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। তার কিছুদিন পর স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনে অযোধ্যানাথ পাকরাশির অনুপ্রবেশ অন্দরমহলে এক অভিনব পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

> স্বর্ণকুমারীর বয়স তখন পাঁচ-ছয় তখন সমকালের পক্ষে আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা ঘটল — শুধুমাত্র স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনে জোড়াসাঁকোর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এক অনাত্মীয় পুরুষ। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ না হওয়া অন্তপুরের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য অযোধ্যানাথ পাকরাশি। ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠ বধূরা আর স্বর্ণকুমারীরা সব কজন বোনই তাঁর ছাত্রী হলেন — অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের স্কুলপাঠ্য ইংরেজি বইগুলিই হল তাঁদেরও পাঠ্য।[১০]

এমন একটি সুন্দর শৈশব পেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী যা তাঁর সাহিত্য রচনার ভিত্তি গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছিল। বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আপনভোলা মানুষ। ছোটোবেলা স্বর্ণকুমারীকে আকর্ষণ করতে বড়োদাদার ঘরভর্তি নানারকমের বাঁশি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছোটোভাইবোনদের সামনে বসিয়ে ছবি আঁকতেন। স্বর্ণকুমারীর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বাড়ির মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়—

> বিয়ের পর আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের মেয়েদেরও সব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক-একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। . . . আমার যা কিছু বাঙলাবিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি বাংলা বই পড়াতেন...।[১১]

সমকালীন সমাজ থেকে সবক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিল ঠাকুরবাড়ি। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথা ভেঙে তাঁর স্ত্রী নীপময়ীর সংগীত শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেছিলেন বাড়ির গায়ক বিষ্ণুকে। হেমেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেই ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে স্বর্ণকুমারীদের সংগীতচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী অনেক গল্প, উপন্যাসেই তাঁর স্বরচিত গানের ব্যবহার করেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর গানের স্বরলিপি পুস্তক 'গীতিগুচ্ছ' প্রথম প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে।

> সুরসৃষ্টিতে স্বর্ণকুমারীর বিশেষ প্রতিভা ছিল। তাঁর অধিকাংশ গানেরই শুরুতে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী ও তালের নির্দেশ দানের মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, সরস কৌতুক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গীত রচনায়ও স্বর্ণকুমারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[১২]

শৈশব থেকেই স্বর্ণকুমারীর রচনাশক্তির বিকাশ হতে থাকে। তাঁর সাহিত্যচর্চার উন্মেষের পশ্চাতে পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতাদের গভীর অনুপ্রেরণা ছিল। জানা যায় যে ছোটোবেলা তাঁর একটি রচনা পড়ে মহর্ষি এত

খুশি হয়েছিলেন যে লেখার পাশে লিখে দিয়েছিলেন—

> স্বর্ণ তোমার লেখনীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক।[১৩]

স্বর্ণকুমারীর নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

> আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজি হইতে ভাল ভাল তর্জমা করিয়া শুনাইতাম— তাহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেগুলি শুনাইতেন। আমি তাহাকে খুব উৎসাহ দিতাম।[১৪]

এ প্রসঙ্গে পশুপতি শাশমল লিখেছেন—

> ... জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথকতা স্বর্ণকুমারীর কথাসাহিত্যে সুন্দরভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ঘটনার অন্তরালবর্তী আরেকটি জিনিষ লক্ষ্য করার মত। ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ কথনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন ব্যস্ত তখন স্বর্ণকুমারী সেই অনূদিত বিদেশী কাহিনীকে স্বীকরণের কাজে মনোযোগী; পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমুদ্র মন্থনের ফলে সংগৃহীত মুক্তার 'জ্যোতি' 'স্বর্ণসূত্রে' কেমন করে চমৎকার বিরাজ করছে সেই ইতিহাস এখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে কিশোরী স্বর্ণকুমারীর দুর্লভ স্বীকরণ ক্ষমতার পরিচয় পাই।[১৫]

এভাবেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে ঠাকুরবাড়িতে গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং সুরুচিতে গড়া এক নতুন নারীজগত যা সাধারণ বাঙালি মেয়েদের সাহস জুগিয়েছিল প্রগতির পথে।

অনেকেরই ধারণা যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। বিশেষত স্ত্রী শিক্ষা এবং নিজ পরিবারের অভ্যন্তরে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন তা সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর বিবাহের সময়ের স্ত্রী আচার এবং জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা প্রভৃতি লৌকিক প্রথা ঠাকুর পরিবারে প্রচলিত ছিল।

> কারণ তিনি জানতেন এইসব তুচ্ছ প্রথা আর আচারের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে বাঙালির নিজস্ব প্রাণধারা, ওপর থেকে টান দিলে তার মূল যাবে ছিঁড়ে, রস যাবে শুকিয়ে।[১৬]

সূক্ষ্ম এবং মার্জিতরুচির মানুষ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বাড়ির কন্যা এবং বধূদের শিল্পগত রুচি গড়ে তোলার দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। ১১ মাঘের উপাসনার ঘর সাজানোর ভার থাকত মেয়েদের উপর। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন—

> রোজ একটি করিয়া টাকা পাইতাম, সেই টাকায় মাছ তরকারি কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত।[১৭]

স্বর্ণকুমারী মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতের প্রথম আই.সি.এস। বাংলার নারীপ্রগতিতে এই আধুনিক এবং সত্যিকারের উদারনীতিতে বিশ্বাসী মানুষটির অবদানের কথা খুব কম লোকই জানেন। সত্যেন্দ্রনাথ মেয়েদের ভেতর থেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর মেজদাদা সম্পর্কে লিখেছেন—

> আশৈশব ইনি মহিলার বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিলাত যাইবার পূর্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিতৃদেব অন্তঃপুরের মঙ্গলের জন্য যে সকল আচার বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন, অধিকাংশই ইহার পরামর্শে, ইহার প্ররোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল কার্যে পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত ভজাইতেন। ... পিতা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন; পিতা অন্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা সযত্নে ফলবন্ত করিয়া সে ফল সমাজে বিতরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে বঙ্গের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে সমর্পণে ধন্য। একজন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জনয়িতা, একজন স্ত্রী, স্বাধীনতার প্রবর্তক।[১৮]

সত্যেন্দ্রনাথ নারীমুক্তির পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের 'subjection of women' গ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন। স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশেও সত্যেন্দ্রনাথের অবদান রয়েছে। স্বর্ণকুমারীদের ভাইবোনদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর লেখা থেকে জানা যায় —

> বাবা চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্যই বোধহয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালবাসতেন।[১৯]

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীকে। বৃদ্ধবয়সে সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচির মোরাদাবাদিতে শান্তিধামে বাস করাকালীন স্বর্ণকুমারী দুই দাদার জন্য দুটো সেন্ট উপহার পাঠিয়েছিলেন। ছোট্ট উপহার কিন্তু তার মধ্যে মিশেছিল বোনের হৃদয়ভরা ভালবাসা। চিঠিতে সেই ভালোবাসার আকুলতার প্রকাশ শুনি—

> আমার বড় যেতে ইচ্ছে করে তোমাদের কাছে ...[২০]

স্বর্ণকুমারীর জীবনের এই ভ্রাতৃপ্রীতির ছবিই দেখতে পাওয়া যায় তাঁর 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮) প্রভৃতি উপন্যাসে।

ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনের সূচনা থেকেই ঠাকুর পরিবার এই আন্দোলনের সমর্থন করে এসেছে।

> মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপের উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর যে আইনের খসরাটি লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয় তা যথাকালে কর্তৃপক্ষ ও সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদন লাভ করে (১৮২৩, ৩১ মার্চ)। এই আইন বিধিবদ্ধ (১৮২৩, ৪ এপ্রিল) হওয়ার আগে রামমোহন সুপ্রিমকোর্ট-এর বিরুদ্ধে

আবেদন করেছিলেন এবং ওই কার্যে তাকে যে কয়জন সহায়তা করেন তার মধ্যে দ্বারকানাথ ছিলেন অন্যতম। আবার এই আইনকে অস্বীকার করে যে বেঙ্গল হেরালড (১৮২৯, ৫ মে) ও তার বঙ্গানুবাদ বঙ্গদূত প্রকাশিত হতে থাকে তার স্বত্বাধিকারীরূপে রামমোহন দ্বারকানাথ প্রসন্নকুমার প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যখন অর্জিত হল (১৮৩৫, ৩ আগস্ট) তখন দ্বারকানাথ 'ইংলিশম্যান' 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি অতিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিকানা ক্রয় করতে থাকেন; বলাবাহুল্য এই পত্রিকাগুলি এতদ্দেশীয় নাগরিকগণের স্বার্থরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অতঃপুর বিশেষভাবে সাহায্য করতে থাকে। এতদ্ব্যতীত দ্বারকানাথ ১৮৪২ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্য মানবহৈতৈষী জর্জ টমসনকে বাংলাদেশে আনয়ন করেন; এরফলে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৮৪৩, ২০ এপ্রিল) এবং সভার মুখপত্র হল বেঙ্গল স্পেক্টেটর। সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি এই পত্রিকায় যেমন মুদ্রিত হত তেমনি প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিচারবিশ্লেষণেও উক্ত পত্রিকা সৎসাহস প্রদর্শন করত। দ্বারকানাথের সৌজন্যেও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির কর্মতৎপরতায় শিক্ষিত নাগরিকগণের চিত্তে জাগরণ দেখা দিল।[২১]

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল 'হিন্দুমেলা'র মধ্য দিয়ে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল তার পশ্চাতে ঠাকুরপরিবারের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল।

স্বর্ণকুমারীর বিবাহের (১৮৬৭, ১৭ নভেম্বর) মাত্র সাত মাস পূর্বে প্রথম হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ ইতিমধ্যে বহির্জগতের মত অন্দরমহলও এই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠতার সূত্রাবলম্বনে এই মহৎ কার্যটি সুসম্পন্ন হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুকথিত 'হামচুপামহাফ্' বা সঞ্জীবনী সভার অধ্যক্ষ ছিলেন রাজনারায়ণ; স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, আত্মনির্ভরতা ও ঐক্যের প্রতি সভার মনোযোগ ছিল নিবদ্ধ। অন্তঃপুরের রমনী এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও তাঁরা যে এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। স্বয়ং স্বর্ণকুমারী তাঁর স্নেহলতা উপন্যাসের মধ্যে এই গুপ্তসভার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন আগ্রহের সঙ্গে; ...[২২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়

'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত। দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।[২৩]

স্বর্ণকুমারীর অনেক উপন্যাসেই তাঁর স্বদেশানুরাগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় বিবাহের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল—

গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর।[২৪]

এ সম্পর্কে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র নতুন সংবাদ বিভাগে বিবাহের বিবরণ থেকে জানা যায়—

কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর।[২৫]

স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিবাহের সময় স্বর্ণকুমারীর বয়স হিসেবানুযায়ী অনধিক ১১ বৎসর তিনমাস। সুতরাং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং 'বামাবোধিনী'র প্রদত্ত তারিখ সঠিক হতে পারে না। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুর পর মন্মথনাথ ঘোষের লেখা 'স্বর্ণ-স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে আছে—

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বর্ণকুমারীর জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের বিবাহ হয়।[২৬]

পিতা জানকীনাথ ঘোষালের শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী পিতার যে সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন তাতে লেখা ছিল—

মাতৃদেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র।[২৭]

অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী যখন এগারো অতিক্রম করে বারোতে পদার্পণ করেছেন।

স্বর্ণকুমারীর বিবাহিত জীবন খুব সুখের ছিল। সেসময় জানকীনাথ পেশায় ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। প্রখর ব্যক্তিত্বশালী সাহসী এবং সুপুরুষ জানকীনাথ ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুগামী। স্ত্রীকে তিনি সাহিত্যচর্চায় এবং নারীমুক্তি আনয়নের প্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা দিতেন—

...আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। আজ বহির্জগত আমাকে যেভাবে দেখিতে পাইতেছে, তিনিই আমাকে সেইভাবে গর্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রেমপূর্ণ উপদেশে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণনিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্যজীবনের ঝটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে আমিও সেইরূপ

অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি।[২৮]

জানকীনাথ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের উমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪০-১৯১৭) প্রিয়শিষ্য। রামতনু লাহিড়ী, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কালীচরণ ঘোষ, যদুনাথ রায় প্রভৃতি ব্যক্তির সংস্পর্শে ও অনুপ্রেরণায় তিনি উপবীত ত্যাগ করেন। 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে সরলা দেবী পিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> বড় মাসিমা সৌদামিনী দেবীর বিবাহ অনেককাল আগে সনাতন রীতিতেই হয়ে গেছে, কিন্তু মেজ মাসিমা সুকুমারী দেবীর সময় থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়ে জামাইয়ের বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করান হত, এবং পূর্বাপর প্রথামত কন্যা সহ জামাইরা শ্বশুরগৃহেই স্থায়ী বাসিন্দা হতেন। আমার পিতা এই দুটি রীতিই মানতে অস্বীকৃত হলেন। দৃপ্তপুরুষ তিনি বলেন,— ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্ম মূলগত কোন ভেদ নেই, নিরাকার বা সাকার ব্রহ্মের উপাসক— দুইই হিন্দু। সুতরাং আলাদা করে ব্রহ্মোপাসক বলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়া অনাবশ্যক। দ্বিতীয় বিবাহের পর তিনি পত্নীকে স্বগৃহে নিয়ে যাবেন, শ্বশুরগৃহে থাকবেন না। দাদামহাশয় তাঁর এই শর্তই মেনে নিলেন।[২৯]

ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত রীতিনীতিতেও জানকীনাথ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

> স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল তখন আমাদের আরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে আমাদের শুইবার ঘরে ঘাট-বিছানা ছাড়া অন্যকোনও তেমন আসবাবপত্র থাকিত না; কিন্তু জানকীবাবু আসিয়াই তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে যখন সজ্জিত করিলেন তখন তাঁহার অনুকরণে ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিয়া গেল। কক্ষগুলির আমূল সৌষ্ঠব বর্ধিত হইল এবং রীতিমত সুসজ্জিত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আর একটি নতুন জিনিষের প্রবর্তন করেন, সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।[৩০]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানকীনাথকে খুব স্নেহ করতেন। স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন—

> যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এতদূর উন্নতি হইত কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি যে অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।[৩১]

স্বর্ণকুমারী তিন কন্যা ও এক পুত্রের জননী ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় তাঁর প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর। তারপর ১৮৭১ সালে পুনাতে একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথের জন্ম হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন সরলাদেবী চৌধুরানী এবং ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলার বয়স যখন বছর ছয়েক তখন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে brain concussion-এ মারা যায়। ঊর্মিলার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জানকীনাথ আইনের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে আসেন বিলেত থেকে, আর যাওয়া হয়নি।

সেকালের ধনীগৃহে শিশুরা ধাত্রীস্তন্যে পালিত হত এবং পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে থাকার রেওয়াজ ছিল। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরাও এভাবেই বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। সরলা দেবী জানিয়েছেন—

> ...ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রাণীর মত দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, শুনেছি কর্তাদিদিমার কাছে থেকেই তারা এই ঔদাসিন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বড়মানুষের মেয়েদের এই ছিল পেট্রিশিয়ন চাল। গরীবের ঘর থেকে আসা ভাজেরা কিন্তু তাদের প্লিবিয়নের হৃদয় সঙ্গে করে আনতেন— ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাদের ব্যবহার আর একরকমের দেখতুম।[৩২]

স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী ছিলেন মায়ের ছায়াসঙ্গিনী। পত্রিকার কাজে সাহায্য করা থেকে শুরু করে সাংগঠনিক কাজকর্ম সবকিছুতেই মাকে সাহায্য করতেন হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মাইনর পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। হিরণ্ময়ী খুব ভালো কবিতা লিখতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁর পিসেমশায় পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফনিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৮৪ সালে। এই বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত 'বিবাহোৎসব' অভিনয় করিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের দিয়ে। স্বর্ণকুমারীর একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ছিলেন আই.সি.এস। তিনি বিয়ে করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা কোচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীর কন্যা সুকৃতিকে। কর্মসূত্রে তিনি বোম্বাইতে থাকেন এবং সেখানেই স্থিত হন। স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল পাঞ্জাবের আর্যসমাজ নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে ১৯০৫ সালে। সরলা দেবী ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অনার্সে বেথুন কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। সরলাদেবী খুব ভালো সংস্কৃত, ফরাসি ও ফার্সি ভাষা জানতেন। বি.এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ার জন্য তিনি 'পদ্মাবতী মেডেল' লাভ করেন।

প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ এবং মার্জিতরুচির মহিলা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। 'কাহাকে?' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ 'An unfinished song'-র ভূমিকায় E.M Lang লিখেছিলেন—

> She is tall and stately, a veritable 'grand dame', her face is noble and expressive of high intelligence and her manner calm and perfectly dignified.[৩৩]

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারীদের ভাইবোনদের প্রচেষ্টায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বর্ণকুমারীর রামবাগানের বাড়িতে তখন প্রায়ই কখনও সাহিত্য ও সংগীতের আসর বসত। সেখানে প্রফুল্লময়ী দেবী, কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী চৌধুরী যোগ দিতেন। শরৎকুমারী যখনই যেতেন দেখতে পেতেন স্বর্ণকুমারী সেতার বাজাচ্ছেন বই পড়ছেন, আবার কখনও মিষ্টি তৈরি করছেন। শোনা যায় ঘাড় সোজা রাখা এবং stepping ঠিক করা জন্য স্বর্ণকুমারী মাথায় কলসী রেখে হাঁটা অভ্যেস করতেন। ঘাড় সোজা করে হাঁটার মধ্যে দিয়ে চেহারায় ব্যক্তিত্ব ফুঠে

উঠে। ঠাকুরবাড়ির সবার শৈল্পিক রুচি ছিল অসাধারণ। সে যুগে বিউটি পার্লার তো ছিল না। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বউরা ঘরোয়া রূপচর্চা করতেন। স্বর্ণকুমারীর দিদি শরৎকুমারীর রূপচর্চা এবং রান্নার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। রূপটান মেখে অনেকটা সময় তিনি কাটিয়ে দিতেন চৌবাচ্চার জলে। বাঙালি মেয়েদের শাড়ি পরার নতুন ধরনের সঙ্গে সায়া, সেমিজ, ব্লাউজ এবং জ্যাকেট পরার প্রচলনও শুরু হয়েছিল ঠাকুরবাড়ি থেকেই। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতিও স্বর্ণকুমারীর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিন ছেলেমেয়ের জন্যই স্বতন্ত্র পরিচারিকা ছিল এবং একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন যিনি বাড়িতেই থাকতেন। গান শেখায় সরলা দেবীর পারদর্শিতা দেখে পিয়ানো শেখানোর জন্য একজন মেমও নিযুক্ত করে নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। ঘরে বাইরে মায়ের পাশে থেকে স্বর্ণকুমারীকে অনুপ্রেরণা দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দুই মেয়ে হিরণ্ময়ী দেবী এবং সরলা দেবী। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় (১২১৪) স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বাল্যসখী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতী'তে এটিই স্বর্ণকুমারীর লেখা প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৭৯ সালে তাঁর রচিত 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন শরৎকুমারী চৌধুরানীকে। 'বসন্ত উৎসব' রচনার উৎস সম্পর্কে জানা যায় যে ঘরোয়া আসরে সেকালের বসন্ত উৎসব সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব দিলেন সেকেলে ধরনের বসন্ত উৎসবের। ঠাকুরবাড়ির সবারই উদ্দীপনা তো কম নয়। ঠিক হল ছাতের বাগানে রাত্রিবেলা রঙিন আলোয় আবির খেলা হবে। এতে আনন্দ উদ্দীপনায় স্বর্ণকুমারী 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যটি। বাংলা সাহিত্যে অপেরাধর্মী গীতিনাটিকা রচনায় স্বর্ণকুমারীই ছিলেন পথিকৃৎ।

> বসন্ত উৎসবের নায়িকা লীলা সাজলেন কাদম্বরী। আর যে সন্ন্যাসিনীর কৃপায় লীলা তাঁর প্রেমিকাকে ফিরে পেল সেই সন্ন্যাসিনী সাজলেন স্বর্ণকুমারী। গেরুয়া সাজের সঙ্গে তাঁর উদাসিনী প্রকৃতিটি সুন্দর খাপ খেয়েছিল। নায়ক হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[৩৪]

ভাবনা চিন্তায় সবক্ষেত্রেই যুগ থেকে অনেক এগিয়েছিল ঠাকুরবাড়ি। যে সময় সমাজে বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী মুক্ত আকাশ দেখার ছাড়পত্র পায়নি, ঠিক তখনও ঠাকুরবাড়ির পুরুষ এবং মহিলারা একই মঞ্চে অভিনয় করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার প্রত্যুষলগ্নে স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যজগতে তাঁর সৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। গল্প, উপন্যাস, গাথা, প্রবন্ধ, গীতিনাটক। কৌতুকনাট্য বা শারাড। কাব্যনাট্য, প্রহসন, নাটক, পাঠ্যপুস্তক, স্বরলিপিগ্রন্থ সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন—

> স্বর্ণকুমারী জীবনযাপনে এবং সাহিত্য-সাধনায় নারীর জন্য স্বতন্ত্র আসনের দাবিদার ছিলেন না। পুরুষদের সমকক্ষতার প্রতিস্পর্ধা তার ছিল। আমাদের সমাজে অনেকখানি পিছিয়ে থাকার জন্য মেয়েদের সাহিত্যচর্চাকে একটু সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখার রেওয়াজ আছে। স্বর্ণকুমারীর কীর্তির সামনে দাঁড়ালে যে মনোভাব স্তব্ধ হয়ে যাবে।[৩৫]

স্বর্ণকুমারী দেবীর সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রকাশ তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তায়। শৈশবে পিতার কাছে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'পৃথিবী' উৎসর্গ করেছিলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে উৎসাহ গড়ে তোলার জন্য বিদেশি গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমকালীন বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে তাদের পরিচয় করাতে চেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে তিনি কিছু পরিভাষা সৃষ্টি করেছিলেন, যা বাংলাসাহিত্যে অমূল্যসম্পদ রূপে পরিগণিত।

তাঁর সামাজিক প্রবন্ধ 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' ('ভারতী ও বালক' বৈশাখ ১২৯৫) 'বিধবা বিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা' (ভারতী, ভাদ্র ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর সচেতন সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩০২ সালের 'ভারতী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নীলগিরির টোডা জাতি' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরেছিলেন যা সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের প্রেক্ষাপটে নারী কীভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলার মনোবল ও যোগ্যতা অর্জন করে আত্মবিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, সেই ইতিহাসকে জানতে হলে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিগণিত স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যকীর্তিকে তার স্বমহিমায় তুলে ধরা আবশ্যক।

> ঊনবিংশ শতকের শেষ অর্ধার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধার্ধ-এই দুই যুগ জুড়েই অব্যাহত ছিল তাঁর সৃজনশীলতা। আর তাই, লেখক হিসেবে তিনি যেমন দেখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতার গর্ভ থেকে নতুন চেতনার জাগরণ, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ-বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে মেয়েদের দিনযাপনের অসহায়তা, আর সেই যাপিত জীবনের অধিকারহীনতাকে অনুভব করে নতুন সংবেদনার উন্মেষ; অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর সূচনা মুহূর্ত থেকে দেখেছেন রাজনৈতিক উন্মাদনা — বঙ্গভঙ্গের অন্যায় আক্রমণ, সে-অন্যায় রোধের সংগ্রাম, বয়কট আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি কিংবা জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতায় নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মতাদর্শগত বিরোধ। আর এই সব বিষয়ে নানা ভঙ্গিতে কখনো গল্প-উপন্যাস, কখনো বা প্রবন্ধে-রূপ নিয়েছে তাঁর রচনায়, চিরকালীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীনতাকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁর লেখালেখি।[৩৬]

সমগ্র দেশে এবং নিজ পরিবারের মধ্যে যে সংস্কারমুখীন আবহাওয়া ছিল তার প্রভাব তাঁর সাহিত্যজীবনের সহায়ক হয়েছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণের মুখ্য বিষয় ছিল নারীজাগরণ। অসহায়, নির্যাতিত, অন্তেবাসী নারীর মর্মদাহকে স্বর্ণকুমারী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেজন্যই তিনি চেয়েছিলেন মেয়েদের মধ্যে আত্মশক্তি জেগে উঠুক। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। তাঁর সচেতন মননের স্বাক্ষর রূপ পেয়েছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সহ মোট এগারোটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ' প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর বয়স তখন কুড়ি বৎসর। মেয়েদের পক্ষে যে

উপন্যাসের মতো একটা কঠিন বিষয়কে আয়ত্ত করা সম্ভব, এই ধারণা ছিল না সেদিনকার সমাজের। গ্রন্থটিতে লেখিকার নাম না-থাকায় বিদেশে বসে বইখানা পড়ে স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেবেছিলেন গ্রন্থটি অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। এ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় ঃ

> মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার রচনা। তিনি লিখিলেন জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?[৩৭]

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম উপন্যাসে আত্মপরিচয় না-দেওয়ার কারণ জানা না-গেলেও অনুমান করা যায় যে প্রথম রচিত উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মনে হয়তো একটা দ্বিধা ছিল, যে গ্রন্থটি সাহিত্যিক মহলে কতদূর গৃহীত হবে। কারণ সেসময় মেয়েদের রচনাকে একটু হীন চোখে দেখা হত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে মেয়েদের সৃজন ক্ষমতা নেই। ১৮৬৫ সালে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বছরই হেমাঙ্গিনী দেবী রচনা করেছিলেন 'মনোরমা' গ্রন্থটি। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। এ সম্পর্কে হেমাঙ্গিনী দেবী 'মনোরমা'-র ভূমিকায় লিখেছেন—

> ইহা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এ পর্যন্ত কাহাকেও না দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম।[৩৮]

সমাজ এবং সাহিত্যে মেয়েদের জন্য দ্বিবিধ মান নির্ধারিত ছিল। সেজন্যই তাদের সৃষ্টিকে অবহেলা, নিন্দা এবং বিদ্রূপের শিকার হতে হত। এভাবেই থেমে যেতে হয়েছিল কৃষ্ণভাবিনী দাসকে। 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধে তিনি যে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। লিঙ্গ-রাজনীতির চাপে কৃষ্ণভাবিনীর পরবর্তীকালের লেখায় আর নারীবাদী স্বর শুনতে পাওয়া যায়নি। তবে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে স্বর্ণকুমারী রচিত 'দীপ-নির্ব্বাণ' পাঠক এবং সমালোচক মহলে সমাদৃত হয়েছিল। 'সাধারণী' কাগজ লিখেছিল—

> ...শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার লেখা। আমাদের কথা। স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।[৩৯]

গ্রন্থটি বিদেশি সমালোচকেরও প্রশংসা লাভ করেছিল—

> At a very early age Mrs. Ghosal... Showed unusual ability and force of character, before she was twenty she had published an anonymous novel which became an immediate success, and the revelation of its authorship caused a great sensation, as it was the first time an Indian woman had attempted such a feat.[৪০]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের এগারো বছর পর 'দীপ-নির্ব্বাণ' প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের

লেখিকার লেখায় ভাষার বলিষ্ঠ বাঁধুনি, স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গি এযুগের পাঠক মনেও বিস্ময় জাগায়।

স্বর্ণকুমারীর পরবর্তী উপন্যাসগুলি স্বনামেই প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিম যুগ এবং রবীন্দ্রযুগের মধ্যবর্তী সেতু ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

> তাঁর উপন্যাসগুলির দিকে বাইরে থেকে দেখলেও বোঝা যায় বঙ্কিম-যুগের রীতি অনুযায়ী ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস দুরকম লেখারই আত্মনিয়োগ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্দান্ত প্রভাবের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেছেন। ১৮৯৮-এর পরে দীর্ঘ বাইশ বছর কলম না-থামালেও উপন্যাস লেখেননি। অবশেষে ১৯২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে তিনটি বই প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র-প্রভাব তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্কিমী উপন্যাসে আবর্তনের দীর্ঘকালীন অভ্যাস থেকে তিনি রবীন্দ্ররীতিতে উত্তরণের চেষ্টা করলেন এই তিনটি বইয়ে। অভ্যস্ত পুরাতন রীতির সঙ্গে নব্যরীতির মিশ্রণ ঘটল। তবুও তিনিই একমাত্র ঔপন্যাসিক যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা একযুগ থেকে অন্যযুগে পদার্পণ অনুসরণ করি।[৪১]

ইতিহাসাশ্রয়ী এবং সামাজিক বিষয়ভিত্তিক মোট এগারোটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসগুলি হল 'দীপ-নির্ব্বাণ' (১৮৭৬), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), এবং 'ফুলের মালা' (১৮৯৫), 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'স্নেহলতা বা পালিতা' (দুইভাগে প্রকাশিত – ১৮৯০, ১৮৯৩), 'কাহাকে?' (১৮৯৮) এবং 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) সামাজিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। স্বর্ণকুমারীর বেশিরভাগ উপন্যাসই রচিত হয়েছিল বঙ্কিমযুগে। শুধু 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী', 'মিলনরাত্রি' ত্রয়ী উপন্যাসটি রচিত হয় রবীন্দ্রযুগে।

> ঘরে বাইরে বেরুবার পরে ঐ একই রাজনৈতিক বোধ থেকে নিজের মতো একটি উপন্যাস লিখতে চাইলেন। নিজের মতোই লিখলেন। তার ভেতরে বঙ্কিম থেকে গেলেন, আবার রবীন্দ্রনাথও এলেন। যদি রবীন্দ্র যুগেও তিনি পূর্বযুগের আদর্শেই থাকতেন তো যুগান্তরে এগিয়ে যাবার ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত না।[৪২]

স্বর্ণকুমারীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যজগতে অনেক মহিলা লেখিকারই আবির্ভাব হয়েছিল। অনেক লেখিকার হাতে উপন্যাসের খসড়া তৈরির চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর মতো সুদূর এবং বহুপ্রসারী লেখনী আর কারও ছিল না। সমরেশ মজুমদার তাই লিখেছেন—

> তাঁর পূর্বে মহিলা লেখিকারা উপন্যাস রচনার প্রযত্ন করেছিলেন কিন্তু যে জীবনবোধ, মনস্তত্ত্বসম্মত দৃষ্টি, চরিত্রসমূহের অন্তর পর্যবেক্ষণ, সমাজ ও সময়ের পরিধি নিরূপণের তাৎপর্য উপলব্ধির প্রবণতা একজন রচনাকারকে ঔপন্যাসিক সিদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম সেই পুরোগামিতা সম্পূর্ণত স্বর্ণকুমারীর মধ্যেই দৃশ্য।[৪৩]

খুব ভালো সংস্কৃত ও ইংরেজি জানতেন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন জর্জ এলিয়ট। তিনি

চেয়েছিলেন পুরুষ পাঠক সমাজ নারীর রচনাকে করুণার চোখে না দেখে বিচার করুক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে। তাই তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসের ডাক্তারের মুখে শোনা যায়—

> ...the genius shown in the works of George Eliot is in no way inferior to that of any renowned poet or novelist of England, dead or alive.[৪৪]

বিদেশি সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর বহুপঠনের চিহ্ন রয়েছে উপন্যাসটির মধ্যে। স্বর্ণকুমারী নিজে 'কাহাকে?' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন 'An unfinished song' নামে। ১৯১৩ সালে লন্ডনে T. Werner Laurie Ltd. থেকে স্বর্ণকুমারীর অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। অনূদিত গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখা ছিল—

> This is the first time that a book of hers has been brought before the English Public, and it should be of deep interest to all those who are concerned with the women question, for it presents a careful study of the Indian girl at this intensely interesting stage in the history of her development and particularly of her attitude towards love and marriage; all that is best in the old traditions of her race still holds her fast, but she is reaching old eager has for the freedom that will someday be hers.[৪৫]

'কাহাকে?'-র ইংরেজি অনুবাদ বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল। উপন্যাসটি যখন রচিত হয়েছিল তখনও বিংশ শতাব্দীর শুরু হয়নি। সেইসময় ভালোবাসা এবং দাম্পত্য সম্পর্কে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেছিলেন তিনি 'কাহাকে?' উপন্যাসে। ভূয়সী প্রশংসা করেছিল Westminister Gazette-এর সম্পাদক—

> Miss Ghosal, as one of pioneers of the women movement in Bengal, and fortunate in her own upbringing, is well qualified to give this picture of a Hindu maiden's development.[৪৬]

উপন্যাসটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল বিদেশি পাঠকমহলে যে ১৯১৪ সালে 'An unfinished song'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ওই একই কোম্পানি থেকে। পরবর্তীতে নিউইয়র্কের The Macmillan company থেকে আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'কাহাকে'-র আরেকটি অনুবাদ ১৯১০ সালে 'To whom? or an Indian love story' নামে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন স্বর্ণকুমারীর ভাইঝি হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শোভনা দেবী, অনুবাদটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মহারানী সুনীতি দেবী।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে স্বর্ণকুমারীর বেশ কয়েকটি রচনা বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তাঁর

শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ফুলের মালা' 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'The Fatal Garland' নামে। অনুবাদ করেছিলেন ক্রিস্টিনা অ্যালবার্স। ভূমিকাতে অনুবাদ লিখেছিলেন—

> This story which has some events of Indian history of the 14th century as its background, contains much of Indian Philosophy, which give it its main value. We trust it will do some thing towards making our western friends better aquainted with Hindu ideas. It is remarkable how little even englishmen who have lived for years in this country in many cases understand Hindu thought.[৪৭]

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদটি সচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সমাজে মেয়েদের জীবন কীভাবে মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ফুরিয়ে যায় তার ছবি। তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্প, উপন্যাসে। আবার সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'যমুনা' গল্পের যমুনা এবং 'তিনটি দৃশ্য' গল্পের ধনিষ্ঠা স্বামীর অন্যায়-অনাচারকে মেনে নেয়নি। প্রতিবাদ করেছে। স্বর্ণকুমারীর লেখা চোদ্দটি ছোটোগল্পের সংকলন 'Short Stories' নামে প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজের Ganesh & Co. থেকে। সুদক্ষিণা ঘোষের 'স্বর্ণকুমারী দেবী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়—

> গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'To the Brave' এই আখ্যায়, একটি ইংরেজি কবিতাও যুক্ত হয়েছিল উৎসর্গপত্রে। ভূমিকায় স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন যে, বই-এর সব কটি মূল গল্পই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত আর ইংরেজি অনুবাদগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে ভারতের কয়েকটি ইংরেজি সাময়িক-পত্রে।[৪৮]

১৯৩০ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর রাজকন্যা নাট্যোপন্যাসের নাট্যরূপ 'দিব্যকমল' নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন স্বর্গতা মা সারদা দেবীকে। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন—

> ফুটেছিল এ কমল
> মানস কনক-সবে
> যতনে এনেছি তুলে
> তোরে মা স্মরণ করে।
> যদিও নিকটে নেই
> স্মৃতিপূর্ণ তোমাতেই
> একবার নেমে এসো
> দেখা দাও ক্ষণতরে।[৪৯]

চিত্রা দেব তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে লিখেছেন 'দিব্যকমল' নাটকটি জার্মান ভাষায় 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে অনূদিত হয়েছিল। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র'-র ভূমিকায় লিখেছেন—

> ...'দিব্যকমল' (১৯৩০) নাটকটি জর্মান ভাষায় Princess Kalyani নামে অনূদিত।[৫০]

আবার মীনা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্ণকুমারী দেবী' বইটিতে একটি ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন—

> 'রাজকন্যা' নাট্যোপন্যাসের Princess Kalyani নামে ইংরেজিতে অনুবাদ হয় মাদ্রাজ থেকে ১৯৩০ সালে, এবং জার্মান ভাষায় অনূদিত হয় 'Kalyani' নামে ১৯২৭ সালে।[৫১]

সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বর্ণকুমারী তাঁর স্বর্ণস্বাক্ষর রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এমন বহুমুখী প্রতিভা আজকের যুগেও দুর্লভ। কিশোরীদের জন্য রচিত 'গল্পসল্প' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সাহিত্যরসিক পাঠক-পাঠিকারা শৈশব থেকেই এই বইটির সঙ্গে পরিচিত। অমৃতলাল বসুর লেখা 'কৃপণের ধন' প্রহসনের নায়িকাকেও বলতে শোনা যায়—

> আমার এই বইখানি বেশ লাগে; ...গল্পগল্প-কি মিষ্টি নাম।...মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মতো শেখে। দেখ দেখি, কেমন লিখেছেন, যেখানটা পড়ি, সেখানটাই মিষ্টি, আরও মিষ্টি।[৫২]

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। 'ভারতী'কে কেন্দ্র করেই তাঁর সাহিত্যজীবনের বিকাশ ঘটেছিল। স্ত্রী শিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি 'ভারতী'তে যে মত ব্যক্ত করেছেন, তা সমাজমনকে সচেতন করার সহায়ক হয়েছিল।

> মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে পত্রিকায়। বোঝা যায় 'ভারতী' কোনো অর্থেই মেয়েদের কাগজ না হলেও সম্পাদিকার মানস চোখের সামনে পাঠকদের থেকে পাঠিকাদের উপস্থিতিই ছিল জোরালো। পাঠিকাদের দিকে তাকিয়েই তিনি 'একটি প্রস্তাব' প্রবন্ধে 'সখী সমিতি'র মতো মেয়েদের সমিতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। 'সখী সমিতি'র নানান খবরাখবর যে 'ভারতী'তে ছাপানো হত, সেও তা পাঠিকাদের দিকে তাকিয়েই। শুধু তাই নয়, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' উনিশ শতকের নারী আলোচনায় যুগান্তর নিয়ে এসেছিল বলা যায়। নারী-পুরুষের ক্ষমতা সমতা নিয়ে পশ্চিমদেশে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আসরে তাকে হাজির করা হল স্বর্ণকুমারীর 'ভারতী'রই পাতাতে। স্বর্ণকুমারীর নিজের লেখা 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' কিংবা কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা 'স্ত্রী লোক ও পুরুষ' সে যুগের পটভূমিতে রীতিমত বৈপ্লবিক।[৫৩]

স্বর্ণকুমারী দেবী যখন 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন সাময়িক পত্রিকার জগতে এক অনিশ্চয়তা চলছিল। দেখা যায় এই সংকটের সময়ও 'ভারতী'র প্রকাশ নিয়মিত ছিল এবং বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

> সেই সময়, যখন ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে বাংলার সমাজে জেগে উঠছে নতুন মূল্যবোধ, অনেক প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে নতুন যুগের কষ্টিপাথরে,আবার অনেক শিক্ষিত মনের গভীরেও রয়ে যাচ্ছে পুরনো সংস্কারের চোরা টান,— আর এই টানাপোড়েনের পাশাপাশি তো রয়েইছে রক্ষণশীল সমাজের প্রবল প্রতিরোধ। এই সময়ে 'ভারতী'র পাতায় আলোচনার একটি মঞ্চ যেন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন সম্পাদক স্বর্ণকুমারী, স্থান পেয়েছিলেন প্রগতিবাদী, রক্ষণশীল— উভয়পক্ষই। ...পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতামতে সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান একটি ছবি খুঁজে নেওয়া যায় এই সময়ের 'ভারতী'র পাতা থেকে।[৫৪]

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ি থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকাটি 'ভারতী'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়। নতুন নাম হয় 'ভারতী ও বালক'। পরবর্তীতে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে আবার 'ভারতী' নামেই প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের পর সাময়িকভাবে স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' সম্পাদনা থেকে বিরত ছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি পুনর্বার 'ভারতী'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'ভারতী' সম্পাদনা স্বর্ণকুমারীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নবীন লেখক-লেখিকাদের আত্মউন্মোচনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি 'ভারতী'র পাতায়।

> স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনা-পর্বেই সবচেয়ে বেশি মহিলা-লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল 'ভারতী'র পাতায়, সে সময়ের 'ভারতী'র এটিও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।[৫৫]

মহিলাদের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী প্রথমা ছিলেন না। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনারর ক্ষেত্রে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সেখানে লৈঙ্গিক বিচার দ্বারা তাঁর মান নির্ধারিত হয় না। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২ মে স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের মৃত্যু হয়। তারপর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। নতুন সম্পাদকের দায়িত্বে আসেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে স্বর্ণকুমারী পেয়েছিলেন উদার সমর্থন। তাঁর 'নবকাহিনী' (১৮৯২) নামক ছোটোগল্পের বইটি তিনি উপহার দিয়েছিলেন স্বামীকে উপহার পত্রে লিখেছিলেন—

> পরশে তব দলিত হৃদয়,
> নবীন জীবন লভে, ফুলে ফুলময়।
> স্বর্গের প্রভাত তুমি প্রশান্ত বিমল।

বিধাতার মূর্তিমান আশীষ মঙ্গল।
তোমারি প্রসাদে এ যে তোমারি কল্যাণ—
তোমারে করিনু আজি উপহার দান।[৫৬]

স্বামীর সংস্পর্শে রাজনীতি এবং থিয়জফির প্রতিও স্বর্ণকুমারী আকৃষ্ট হন। জানকীনাথ থিয়জফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী বঙ্গীয় থিয়জফিক্যাল সোসাইটির মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। স্বর্ণকুমারী কাশিয়াবাগানের বাড়িতে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সভা বসত। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি সহ ঠাকুরবাড়ির অনেকেই থিয়জফির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরলা দেবীর লেখা থেকে জানা যায়—

> সে সময় থিয়জফির খুব প্রচার। আমাদের বাড়িতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা হত, তার প্রেসিডেন্ট মা। যাদের স্বামী বা বাড়ির পুরুষেরা থিয়সফিস্ট, তাদেরই স্ত্রী ও বাড়ির মেয়েরা আসতেন। কলকাতার নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনায় মায়ের সঙ্গে তাদের বেশ সখীত্ব স্থাপন হল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্নেল অল্‌কটের শুভাগমনও প্রায়ই হতে থাকল আমাদের বাড়িতে।[৫৭]

স্বর্ণকুমারীর অনেক গল্প-উপন্যাসে থিয়সফির সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পেও একজন থিয়সফিস্টের কথা আছে। পরবর্তীকালে মাদাম ব্লাডাটস্কির অলৌকিক কার্যকলাপের প্রতি সদস্যদের মনে অনাস্থা দেখা দেয় এবং অনেকেই থিয়সফিক্যাল সোসাইটি থেকে সরে আসেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির মহিলা সদস্যদের নিয়ে স্বর্ণকুমারী গড়ে তোলেন 'সখিসমিতি'।

স্বর্ণকুমারী যে-যুগে জন্মেছিলেন সে-যুগে দেশ জুড়ে চলছিল প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার সংঘর্ষ। বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃত হলেও সমাজে তা গ্রহণীয় হয়নি সহজভাবে। অপরদিকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ তখনও সমাজের আনাচে-কানাচে চলে আসছিল। স্বর্ণকুমারী গভীর বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে সমাজের এই সমস্যাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। 'সখিসমিতি'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন—

> ...অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবারা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া, অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদানও অন্যান্য দেশহিতকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অনাথা বিধবাগণ এইরূপ সৎকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষম হইলে তাঁহারা অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা হইতে অব্যাহিত পাইবেন, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরাও সন্তুষ্ট থাকিবে, যে সকল বিধবারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে আমরা নিষেধ করিতেছি না। যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মাচরণে বৈধব্যকাল অতিবাহিত করিতে চাহেন, তাহাদিগকেই এই অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে হিন্দুরীতিনীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দান-ধর্ম্মই শাস্ত্রানুমোদিত বৈধব্যচিত কর্ম্ম। বিদ্যাদানের পর দান আর নেই। পরোপকার পরম ধর্ম। হিন্দু বিধবারা অন্তঃপুরশিক্ষার ভার গ্রহণ

করিলে অশেষ উপকার দর্শিবে।[৫৮]

১২৯৫ সালে ১৫ পৌষ সখিসমিতির উদ্যোগে মহিলা শিল্পমেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

> ...অন্তঃপুর মহিলাগণের হৃদয় মনের প্রসারতা সম্পাদন এবং তাঁহাদের শিল্পোন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগের জন্য এবং মহিলাগণ কর্তৃক বৎসরান্তে উক্ত নামে একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সংগঠিত হইত। এই প্রদর্শনীতে বোম্বাই, আগ্রা, দিল্লি, জয়পুর, কানপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের শিল্পাদি রক্ষিত হইত এবং মহিলাগণ তাঁহাদের রচিত নানারূপ শিল্পও প্রেরণ করিতেন। শিল্পনৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর মহিলাগণের নিকট 'মহিলা শিল্পমেলা' একটি বিশেষ আনন্দ উৎসব বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা প্রতিবৎসর ইহার জন্য অপোস করিয়া থাকিতেন। এই মেলা হইতে যে অর্থ লাভ হইত, তাহা 'সখিসমিতি'র ভাণ্ডারে যাইত।[৫৯]

স্বর্ণকুমারী 'ত্রয়ী' উপন্যাস 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি'র মধ্যে নানা প্রসঙ্গে স্বদেশীয় শিল্পমেলা বা প্রদর্শনীর কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন। ১২৯৫ সালে প্রথম আয়োজিত এই মেলায় রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বইটির উপসত্ব দান করেছিলেন 'সখিসমিতি'কে।

> এ অভিনয়ের দর্শক ও অভিনেতা ছিলেন মহিলা, সেজন্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে এ অভিনয়টি একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত হতে পারে।[৬০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের ইতিহাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পুরুষতন্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে ঠাকুরবাড়ির মহিলারাই প্রথম বাংলার নারীদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবীর কথা। রক্ষণশীল পণ্ডিতি সমাজে বাস করেও দিগম্বরী স্বামীর অনাচারকে মেনে নিতে পারেননি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান অনুসারে দিগম্বরী স্বামী সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু প্রতিদিন সকালে স্বামীর শয্যার কাছে গিয়ে মাটিতে প্রণাম করে আসতেন। যে যুগে পতিকে পরমেশ্বর জ্ঞান করে পতির সমস্ত ব্যভিচারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার রীতি ছিল, সেই জায়গায় পতিকে মানুষ মনে করে স্বামী সংস্রব ত্যাগ করার যে মানসিক স্বাধীন সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা দিগম্বরী প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে বাংলার ইতিহাসে নারী স্বাধীনতার বীজ সেদিনই রোপিত হয়েছিল।

এই তেজস্বিনী মহিলারাই নাতনি ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ঠাকুরপরিবারের সংস্কারমুখীন পরিবেশে স্বর্ণকুমারীর যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তারই প্রভাবে তিনি মেয়েদের অসহায়তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করিছেলেন। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ এবং লেখা-লেখির মাধ্যমে তিনি সমাজকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। সমাজ এবং দেশের উন্নতির জন্য নারীজাতির উন্নতি প্রয়োজন, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

> ...জাতির এক অংশের সহিত অপর অংশের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটিকে অশিক্ষিত রাখিয়া অপরটির শিক্ষা কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিত না হইলে সমাজ যে আধাআধি রকমে ক্ষতি-গ্রস্থ হইল এমন নহে, জাতির সম্যক

> উন্নতি স্ত্রীলোকের সুশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিত রাখিয়া পুরুষেরা কখনই সুশিক্ষিত হইতে পারে না।[৬১]

অসহায় কুমারী এবং বিধবা মেয়েরা যে নিদারুণ সামাজিক নিষ্পেষণের শিকার হয় সেজন্য তিনি নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর 'স্নেহলতা বা পালিতা' এবং 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসে এইসব অসহায় মেয়েদের কথা তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পগুলি পাঠকালে বোঝা যায় যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে তিনি এইসব সামাজিক সমস্যাকে বিচার করেছিলেন। তাঁর এই ভাবনাই রূপ পেয়েছিল 'সখিসমিতি'র মধ্যে।

> ১২৯৮ সালের পৌষ মাস থেকে সখি সমিতি ছয়টি বালিকার ভরণ পোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল— সখি সমিতির আয়-ব্যয়ের বিবরণী থেকে জানা যায় 'শশিপদবাবুর স্কুলে দেওয়া দুইটি বালিকা' এবং 'বেথুন স্কুলে দেওয়া ৪টি বালিকার' খবর।[৬২]

স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী 'সখিসমিতি'র নারীকল্যাণ মূলক কাজে মায়ের সহায়তা করতেন। পরবর্তীকালে 'সখিসমিতি'র প্রভাব কমে গেলে হিরণ্ময়ী দেবী তাকে উজ্জীবিত করে তোলেন ১৯০৬ সালে 'বিধবা শিল্পাশ্রম' নাম দিয়ে। বিধবা শিল্পাশ্রমের অধ্যক্ষ সভার নাম ছিল 'সখি-শিল্প-সমিতি'। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবী (১৮৩৪-১৯৩২), সুচারু দেবী (১৮৭৮-১৯৫৯), এই অধ্যক্ষ সভার সদস্য ছিলেন। শরৎকুমারী দেবী চৌধুরানীর কন্যা উমারানী (১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত) এই শিল্পাশ্রমের সেক্রেটারি ছিলেন। সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়—

> মায়ের প্রতিষ্ঠিত সখি-সমিতি যখন কাল প্রভাবে ম্রিয়মান হয়ে পড়ল, তখন তাকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় দিদি তাকে নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে বর্তমান বিধবা শিল্পাশ্রমে পরিণত করলেন। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর একান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায় অনেক দ্বন্দ্ব ও অনেক প্রীতি দিয়ে গড়া। তাঁর দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হতে এসেছিল। মাতার কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সখি-সমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা শিল্পাশ্রমের জন্ম।[৬৩]

স্বর্ণকুমারীর ইচ্ছে ছিল বোম্বাইতে পণ্ডিতা রমাবাই যে বিধবাশ্রম স্থাপন করেছিলেন, ঠিক তারই মত বাংলার অসহায় নিরাশ্রিতা বিধবাদের জন্য একটি বিধবাশ্রম গড়ে তোলেন। হিরণ্ময়ীর 'বিধবা শিল্পাশ্রম' স্থাপনের মধ্য দিয়েই তাঁর ইচ্ছে রূপলাভ করে। ১৯২৫ সালে হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর এই বিধবা শিল্পাশ্রমের নাম হয় 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম'। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আশ্রমের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

শিল্পবিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বাংলার নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে সমাজ সচেতনতা এবং রাজনৈতিক চেতনার সমন্বয়ে। সতীদাহ রোধ, বিধবা বিবাহ আইন, সহবাস সম্মতি বিল ঘোষিত হবার পর সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। উনিশ শতকের শেষে ধীরে ধীরে প্রতিমায়িত নারীর আড়াল থেকে নারীসত্তার

প্রকাশ হতে থাকে। এই পথ নিতান্ত সহজ ছিল না। ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় কিছু প্রগতিকামী পুরুষের চেষ্টায় নারীর অর্গলমুক্তি ঘটেছিল। কিন্তু এই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও নারীমুক্তি সম্পর্কে মতভেদ ছিল। কারণ নারীসম্পর্কিত চিরাচরিত সামাজিক ধারণা থেকে মুক্তমনে বেরিয়ে আসতে পারেননি অনেকেই। তাই প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা' (১২৭৭) সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অভিমত দিয়েছিল—

> এই আশা করি যে কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রী-জনোচিত শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে,চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব।[৬৪]

স্ত্রীর কাছ থেকে মানসিক নির্ভরতা পাওয়ার জন্যই তারা নারীকে অল্প শিক্ষা এবং অল্প স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষার আলোক পাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা নিজেদের পথ নিজেরাই তৈরি করে নিতে লাগলেন। নারীজাগরণ থেকে আন্দোলনের পর্বে রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০), সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭), কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫), নিস্তারিনী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬) প্রভৃতি মহিলাদের আত্মজীবনী থেকে সেসময়কার মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। এদের লেখায় তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, বৈষম্য এবং সমাজের বাধানিষেধের বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ থাকলেও এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেখা যায় না। তবুও তাদের রচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে নিজেদের অনধিকার এবং পরাধীনতা সম্পর্কে তারা সচেতন হচ্ছিলেন।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তখন মহিলাদের প্রকাশ্যে সভাসমিতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। মহিলাদের জন্য সভা-সমিতি গঠন করে তাদের সংগঠিত করার জন্য প্রগতিকামী পুরুষেরাই তখন এগিয়ে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে সভায় যোগ দিতে থাকেন। বাংলার নারী আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়—

> মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, বিধবা বিবাহের প্রসার করা, কুলীন বিয়ে বন্ধ করা প্রভৃতি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলার ব্রাহ্মরা নারীকে সামাজিক দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছেন।[৬৫]

বাংলার নারীজাগরণে ঠাকুরবাড়ির মহিলারা বাঙালি মেয়েদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্য এবং ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা এবং বধূ বলেই সমাজের পরোয়া তাদের করতে হয়নি। শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে এক আধুনিক জগতের সন্ধান তারা বাঙালি মেয়েদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

একটা জিনিস লক্ষণীয় যে উনিশ শতকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সার্বিক বিকাশ ছাড়া মেয়েদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, একথা কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি উপলব্ধি করেছিলেন। বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন, সমাজসেবী সংস্থা ও অনেক প্রগতিকামী মহিলারা মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, সরলা দেবী চৌধুরানী ও রোকেয়া সাখাওয়াৎ প্রমুখ।

> পরাধীনতা ও শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে এরা নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দিলেন।

> নির্যাতিত নারীদের ঘটনা বর্ণনা করে তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, বিভিন্নভাবে নিপীড়িত নারীসমাজ মুক্তির প্রত্যাশায় প্রবলভাবে আলোড়িত হলেও অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীলতার কারণে নিপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়। সেজন্য তারা বললেন যে, নিপীড়িত নারীসমাজ নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বা নিজে জীবিকা অর্জন না করলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরনির্ভরতার জন্য সামাজিক পারিবারিক নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে না।[৬৬]

সামাজিক পশ্চাতপদতা সত্ত্বেও অনেক মহিলা স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন। নারীসমাজকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হলে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচন প্রয়োজন— নারী-আন্দোলনের সূচনাপর্বে এ কথা তারা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল' এর সমর্থনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বন্দী হলে নারী সমাজকে আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সরলাদেবী চৌধুরানীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় বেথুন স্কুলে কামিনী রায় ও লেডি অবলা বসু প্রমুখ ছাত্রীদের নেতৃত্বে মেয়েদের মনে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

> ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সুরেন বাঁড়ুয্যে যখন জেলে যান, তখন সবাই একটা কালরঙের ফিতে আস্তিনে বাঁধলুম। কেন তা ঠিক জানতুম না। কিন্তু রাস্তায় স্কুলযাত্রী অনেক ছেলেদের হাতেও সেইরকম ফিতে দেখে একটা সহবেদনার বৈদ্যুতী খেলতে লাগল মনে। একটা বড় কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি অনুভব করতে লাগলাম।[৬৭]

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেসের কাজকর্মে মহিলাদের এগিয়ে আসতে দেখা যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজীবন জানকীনাথ ঘোষাল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামীর অনুপ্রেরণায় স্বর্ণকুমারী রাজনীতিচর্চাও করেন।

> ১৮৮৯ সালে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশনে ছয়জন মহিলা ডেলিগেট যোগ দেন। এঁদের মধ্যে বাংলার স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী দেবী অন্যতম। ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়। সভা শেষে কাদম্বিনী দেবী সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।[৬৮]

এ প্রসঙ্গে ভারতের নারী আন্দোলনের প্রধান নেত্রী অ্যানি বেসান্তের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল—

> One of the delegates Mrs. Kadambini Ganguly was called on to move the vote of thanks to the chairman, the first woman who spoke from the congress platform, a symbol that Indian's freedom would uplift Indian's womanhood.[৬৯]

১৮৯০ সালে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনেও স্বর্ণকুমারী ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী ''প্রতিনিধি'' -রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। আর কোন মহিলা প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই।[৭০]

কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগলের লেখা থেকে জানা যায়—

> সুসাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচজন মহিলা এবারকার অধিবেশনে যোগদান করেন। কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সংক্ষেপে কিছু বলেও ছিলেন।[৭১]

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'স্বর্ণস্মৃতি' নামক প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে—

> ...১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় যখন সার ফিরোজ সাহ মেটার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়, তখন ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি উহাতে 'প্রতিনিধি' রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় রমণী কংগ্রেসে প্রতিনিধি যোগদান করেন নাই।[৭২]

মালেকা বেগম রচিত 'বাংলার নারী আন্দোলন' বইটিতেও একই তথ্য পাওয়া যায়।

> ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের প্রস্তাব উত্থাপনও আলোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়। সভা শেষে কাদম্বিনী দেবী সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।[৭৩]

রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলার নারীসমাজের মুক্তির জন্য সাংগঠনিক কাজকর্ম ও আন্দোলন করে গেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সমকালে জন্ম হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর। পরিবারের অভ্যন্তরে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত ছিল। নবোদ্ভূত জাতীয় আন্দোলনের পরিমন্ডলে তার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে।

> ব্রাহ্মসমাজ, থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্রসমূহ, মহারাষ্ট্র সভা, আর্যসমাজ, সনাতন সভা প্রভৃতির উদ্যোগে এই জাতীয়তাকামী আন্দোলন ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।[৭৪]

তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মজগতেও এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার স্ফূরণ হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় সংগীত রচনা করে তিনি স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

> শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূতনাম,
> মায়ের রাখিব মান— লয়েছি এ মহাব্রত।
> আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর নই শিক্ষা,
> এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।[৭৫]

স্বর্ণকুমারীর পুত্র-কন্যারা মায়ের স্বদেশভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মায়ের সাংগঠনিক কাজকর্মের

সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী। 'বিধবা শিল্পাশ্রম' তারই ফলশ্রুতি। স্বর্ণকুমারী চাইতেন দেশের নারীরা মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে আত্মবিসর্জন করুক। 'জীবনের ঝরাপাতা'য় সরলা দেবী লিখেছেন—

> আমাদের বাড়িতে থিয়সফির প্রভাবের দিনে কাশী থেকে একজন মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মা বলতেন— ''সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে।''[৭৬]

তাঁর 'ত্রয়ী' উপন্যাসের রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী চরিত্রটির মধ্যে সরলাদেবীর জীবনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। সরলার মতোই জ্যোতির্ময়ীকে ব্যায়াম সমিতি স্থাপন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নির্মাণ, বীরাষ্টমী উৎসব ও রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়।

> ...১৩০৯ সালের (১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) মহাষ্টমীর দিন 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তন করলেন সরলা, যার উদ্দেশ্য বাংলাদেশে শক্তিচর্চার প্রসার। পরের বছর, ১৩১০ সালে (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) মহাষ্টমীর দিন বীরাষ্টমী উৎসব হল স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতেই। ...ব্যায়াম প্রদর্শনী, লাঠি-খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, দেশি-তরবারি খেলা, ছোরা খেলা ছাড়াও সে উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের স্তোত্র পাঠ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর পদক-বিতরণ।[৭৭]

মায়ের 'সখিসমিতি' এবং দিদির মহিলা শিল্পাশ্রম পূর্ণতর রূপ পেয়েছিল সরলা দেবীর 'ভারত শ্রী মহামণ্ডল'-এর পরিকল্পনায়।

সমাজে বাল্যবিবাহ তখনও প্রচলিত ছিল। তাই অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলে'র মতো একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সরলা দেবী।

স্বর্ণকুমারীর এই স্বাধীনচেতা কন্যাটি গতানুগতিকতার পথ ধরে চলেননি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহীশূরের মহারানি গার্লস স্কুলে চাকরি করতে গিয়েছিলেন সরলা দেবী।

> ...মেয়েদের বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার মতো ঘটনা এই প্রথম ঘটল মহর্ষি পরিবারে।[৭৮]

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সমগ্র দেশে এক নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন সরলা দেবী। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। হিংসার রাজনীতিকে তিনি সমর্থন করতেন না।

> ১৯০৫-এর বঙ্গ বিচ্ছেদের ক্ষত বাংলার মানুষের মনে তখনো সজীব, তারই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে বিদেশি দ্রব্য বর্জন (বয়কট) আর স্বদেশি আন্দোলন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেসের নরম আর চরমপন্থী দলের বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর বাংলাদেশ বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ বেড়ে উঠেছে ১৯০৮-এ বাংলার কিশোর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যাকাণ্ডের ত্রাসে ত্রাসে গুপ্তহত্যা ও স্বদেশি

ডাকাতি অনেক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের কার্যসূচির অঙ্গ হয়ে উঠতে শুরু করেছে।[৭৯]

সমসাময়িক রাজনৈতিক বাতাবরণের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ হয়েছিল তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায়। রচিত প্রবন্ধ, গল্প এবং উপন্যাস নিজস্ব রাজনৈতিক মতামতের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

> ...কে জানিত বঙ্গ বালকগণ এত পাহারার মধ্যেও বোমার কারখানা সৃজন করিতে পারে! কিন্তু এরূপ কার্য্য আমাদের উন্নতিরই প্রতিকূল, ইহা বুঝিয়া যে পথ আমাদের স্বরাজের প্রকৃত পথ, তাহা নির্মাণেই নববংশের বল নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।[৮০]

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দেখতে পাওয়া যায় শেষ ত্রয়ী উপন্যাস 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) এবং 'নবডাকাতের ডায়েরী' গল্পে। 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীকে বলতে শোনা যায়—

> ... আমাদের পথ তো অত্যাচারের পথ নয়। আমাদের জীবনের সার্থকতা, কার্য্যের সফলতা আত্মপাতে; রক্তপাতকে কখনো যেন আমরা গৌরবের কার্য্য ব'লে বিবেচনা না-করি।[৮১]

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের রাজনৈতিক বোধের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর 'ত্রয়ী' উপন্যাসের চিন্তাধারার মিল রয়েছে।

আবার 'নবডাকাতের ডায়েরি' গল্পে সহৃদয় কেমিক্যাল সাহেবকে বলতে শুনি—

> ...ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই। প্রকৃত বন্ধুর উপদেশ শোন, ও পথ ছাড়।[৮২]

দেশি কলকারখানা, দেশি শিল্পদ্রব্য এবং দেশি সার্কাসের প্রতি আগ্রহ ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর। ঠাকুরপরিবারে এই স্বদেশপ্রীতি সদাজাগ্রত ছিল। সরলা দেবী লিখেছিলেন—

> নতুনমামা একদিন আমাদের কোনো একটা সার্কাসে নিয়ে যেতে চাইলেন— একটা বাঙালীর ও একটা উইলসন সাহেবের— যেটায় আমাদের অভিরুচি। আমি বললুম— ''বাঙালীর সার্কাসে যাব।'' টাটকা বিলেত প্রত্যাগত মেজমামীর ছেলেমেয়েরা বললেন, সাহেবের সার্কাসে যাবেন, ... নতুন মামাও স্বদেশী। তাই সেবারটা বাঙালী সার্কাসেই যাওয়া হল। বড় হয়ে মেজমামীর ছেলেমেয়েরাও ক্রমে ক্রমে বিচারে-আচারে স্বদেশী হতে লাগলেন।[৮৩]

বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ সম্পর্কে যে কারণ দেখিয়েছেন তা তাঁর সুগভীর বাস্তব চিন্তার প্রতিফলন। 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসে রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর কথায় স্বর্ণকুমারীর চিন্তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

> ...বিলিতি জিনিস একেবারে বর্জন করার সময় এখন আসেনি। সেইজন্য কিছুদিন ধরে এখনো আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। ভেবে দেখ দু'বেলা দু'মুষ্টি অন্ন যেসব লোকের মেলে না, তাঁতের দামী কাপড় কিনে পরা কি তাদের সাধ্য? তাঁত শিল্পকে উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানারও বিস্তৃতির আয়োজন চাই, নইলে বিলিতি

সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই হেরে যাব।[৮৪]

আবার 'আমাদের কর্ত্তব্য' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> ...এখানেও ধৈর্য্যের আবশ্যক। দোকানদারের বিদেশী জিনিষ নষ্ট করিয়া, লোককে স্বদেশী গ্রহণে বাধ্য করিলে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। একদিকে সকলকে বুঝাইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, অন্যদিকে দ্রব্য সুলভ করিবার ব্যবস্থা করা চাই। বস্তুতঃ মূল্য সুলভ তাই স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশী বর্জ্জনের সহজ এবং স্থায়ী উপায়।[৮৫]

দেশের নারীসমাজও যে স্বাধীনতার একটা অঙ্গ সে সম্পর্কে তিনি দেশের আন্দোলনকারীদের সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। 'গুরুকুল সমাচার পত্রে' প্রকাশিত একটি রচনায় এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> নারীগণের অন্তঃপুর কারাগৃহের বাহিরে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা-ভোগের বিরোধী অথচ তাঁহারা পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত নহেন।[৮৬]

১৯১১ সালে Green Park-এ কংগ্রেসের অধিবেশনের পর একটি 'সোস্যাল কনফারেন্স' হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী। সভায় সরলা দেবী ও সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা দেন। স্বর্ণকুমারীও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। Indian Marriage Act-এর প্রথমেই যে declaration টি ছিল

> "I am neither a Hindu, a Mahomedan, nor a Christian"
>
> সেটি তুলে দেওয়ার পক্ষে সভায় একটি প্রস্তাব আনেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ declaration টি থাকার পক্ষে ভোট দেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী ও রামভজ দত্ত চৌধুরী। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে বর্ধমান রাজের আপত্তি থাকায় গভর্নমেন্ট এ বিল সমর্থন করেনি।[৮৭]

১৯১৫ সালের চৈত্র মাসে মেরি কার্পেন্টার হলে মহাত্মা গান্ধীর পত্নী কস্তুরবা গান্ধীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষণের পর স্বর্ণকুমারী দেবী অভিনন্দন পাঠ করেন। ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণকুমারী 'জগত্তারিনী সুবর্ণ পদক'-এ সম্মানিত হন। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক।

> কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রতিভার আদর করিয়াছেন। বাঙ্গালার পুরুষশার্দ্দূল স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার রত্নগর্ভা জননী জগত্তারিনী দেবীর নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদান করিবার জন্য একটি সুবর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। উহা বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকাকে প্রদত্ত হয়। স্বর্ণকুমারীকে সাহিত্য সেবার জন্য এই পদক পুরস্কার প্রদত্ত হয়।[৮৮]

১৯৩০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন

স্বর্ণকুমারী দেবী। মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতাবশত সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে না পারায় সর্বসম্মতিক্রমে মূল সভাপতি নির্বাচিত হন স্বর্ণকুমারী দেবী।

> বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতিত্বে কোনো মহিলা-লেখকের দায়িত্ব অর্জনের ঘটনা সেই প্রথম ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যায় লিখিত ভাষণটি সম্মিলনের শেষ দিনে পাঠ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী; আর স্বর্ণকুমারীর সম্মিলনে-প্রদত্ত অভিভাষণটিই তাঁর 'ভারত-সাহিত্যে রমণী প্রতিভা' নামে সুপরিচিত প্রবন্ধ।[৮৯]

কবি মানকুমারী বসু এই অধিবেশনে 'আমার মা' কবিতাটি পাঠ করে স্বর্ণকুমারীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মোজাম্মেল হক 'অনন্ত দুঃখ' কবিতাটির অষ্টম স্তবকে স্বর্ণকুমারীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান।

স্বর্ণকুমারীর কাশিয়াবাগানের বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগমন হয়েছিল। তাঁর ৩নং সানি পার্কের বাড়িতে ত্রিপুরার বড় ঠাকুর, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, দার্শনিক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়, তারকনাথ পালিত, বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন তাঁর ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

স্বর্ণকুমারীর কাজকর্ম ছিল খুব প্রণালীবদ্ধ। সব গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ফাইলের মধ্যে সাজানো থাকত। মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন—

> বাণীসেবায় তাঁহার বিরাম ছিল না, সাহিত্য সাধনায় তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। কতদিন তাঁহাকে ছাপাখানার সম্মুখে গাড়িতে বসিয়া শেষ প্রুফ সংশোধন করিতে দেখিয়াছি।[৯০]

ছিয়াত্তর বছরের জীবনে স্বর্ণকুমারী ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সংকলিত 'সাহিত্যস্রোত' গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েন্ট শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। তাঁর 'ভারত-সাহিত্যে রমণী প্রতিভা' প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সাহিত্য স্রোতে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা যায় যে মারা যাওয়ার বছর খানেক আগেও স্বর্ণকুমারী গানে সুর ও direction দিতেন।

১৯৩২ সালের ২৮ জুন, মঙ্গলবার সানি পার্কের বাড়িতে স্বর্ণকুমারী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। ৩ জুলাই সকাল সোয়া দশটায় তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। 'স্বর্ণ-স্মৃতি'তে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছিলেন—

> ...শেষ সাক্ষাতের দিনে সাহিত্যালোচনায় তাঁহার যে উৎসাহের অগ্নিশিখা, নয়নে যে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা যে এত শীঘ্র নির্ব্বাণলাভ করিবে তাহা কে জানিত? যাহারা আমাদের মত তাহাকে অল্পকালও দেখিবার সুযোগ ও অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন সাহিত্য প্রেমের এই স্বর্ণপ্রতিমা, বাণীসেবার এই মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠা কত সাহিত্যসেবকের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, কত অভিনব প্রেরণা দান করিয়াছেন।[৯১]

মৃত্যুর সময় তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে জীবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বর্ণকুমারী। অন্তিমমুহূর্তে পাশে

ছিলেন পুত্র জ্যোৎস্নানাথ, কন্যা সরলা দেবী, ঠাকুর পরিবারের নিকটজনেরা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীর স্বামী প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। সরলা দেবীর পুত্র দীপক দত্ত চৌধুরীকে খুব ভালোবাসতেন স্বর্ণকুমারী। তিনি তখন লাহোরে ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

বাংলার সাহিত্য-সেবক সমিতি তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ষড়সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে-র আয়োজন করেছিল। কিন্তু তা অনারব্ধই থেকে যায়।

কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের ত্রিমেটোরিয়ামে তাঁর অন্তিম সৎকার হয়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বসুমতী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা', 'জয়শ্রী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। 'The Modern Review' পত্রিকার আগস্ট ১৯৩২ সংখ্যায় শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা হয়—

> She was the first among our ladies to edit a monthly. The Calcutta University honoured her by conferring on her the Jagatarini Medal in 1926. She was the elected President of the 29th session of the Bengali literary conference. She was the first lady to act as its President. It required great courage in those days. The women of Bengal are now enjoying the benefits of her and her collegues and successors' courage and of the obloquy which fell to their lot.[৯২]

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে বিচিত্রা পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—

> স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীসমাজের যে ক্ষতি হয় তার পরিমাপ করা কঠিন। তার লেখায় ও কর্মে সর্ব বিষয়েই তিনি বাঙালীর মেয়েদের প্রবুদ্ধ করে তুলেছিলেন, মেয়েদের সকলরকম প্রচেষ্টাতেই তিনি ছিলেন অগ্রণী।[৯৩]

অনাড়ম্বরভাবে সানি পার্কের বাড়িতে তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেন। সরলা দেবী গানের মধ্য দিয়ে মা'কে শ্রদ্ধা জানান।

উনিশ শতকে যে সকল মহিলা দেশকে আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের এগিয়ে চলার পথে তাদের স্বামীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। রক্ষণশীল সমাজ-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে প্রগতিশীল পুরুষেরা মেয়েদের ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই সুগৃহিণী এবং সুমাতা হওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রমীরাও ছিলেন। যারা নারীজাগরণের ধ্বজাকে তুলে ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন আগামীর পথে। স্বর্ণকুমারী তাঁদেরই একজন।

তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মজগতে রয়েছে যুগের বাধাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনা। তিনি যে যুগের মেয়ে

সেই যুগের মেয়েদের ইচ্ছে থাকলেও সেই ইচ্ছেকে রূপায়িত করার শক্তি ছিল না। সেই সব মেয়েদের কথাই তিনি তুলে ধরেছিলেন তাঁর গল্প, উপন্যাসে। গভীর আত্মমগ্নতার ভেতর দিয়ে তিনি জীবনকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাজের মধ্যে দিয়ে মনের এই প্রসারতাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বর্ণকুমারী।

স্বর্ণকুমারীর কর্মবহুল জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় সমসাময়িক পুরুষ সাহিত্যিকদের তুলনায় কোনো অংশেই তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন তা সত্যিই অবাক করে দেবার মত। পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে পুরুষ এবং নারীর লৈঙ্গিক বিভাজনে মেয়েদের মনন ও সৃজনের সম্মাননা সহজলভ্য নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণকুমারী দেবী আলোচিত হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কীর্তি প্রত্যাশিত সমাদর লাভ করেনি। পাশ্চাত্য দেশের মানুষ অতীত সচেতন। তাই তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায়ে আগ্রহী। উনিশ শতকের নারী জাগরণের সন্ধিকালে পুরুষের পাশে নারীর সম-অধিকার লাভের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, সেই ইতিহাসকে জানার জন্য স্বর্ণকুমারীর কীর্তিকে স্বমহিমায় তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৭৬।

২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৫।

৩. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, পৃষ্ঠা ২।

৪. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ২।

৫. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, পৃষ্ঠা ১৪।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫।

৭. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ৪৪।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯।

১০. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৪।

১১. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ৫৪।

১২. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১২৪।

১৩. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৬।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৩০।

১৫. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ৫৬।

১৬. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ১৯।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৪।
১৮. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ১৭৮।
১৯. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৩৭।
২০. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৪৪।
২১. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
২২. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫।
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৃষ্ঠা ৮৭।
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা ১০।
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১০।
২৬. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ৫১২।
২৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৬।
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৫১২।
২৯. চৌধুরানী, সরলা দেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা', রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২।
৩০. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৩৫।
৩১. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭।
৩২. চৌধুরানী, সরলা দেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা', রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫।
৩৩. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১২৪।
৩৪. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৪২।
৩৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৯৭।
৩৬. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ৫।
৩৭. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ১৪৯।
৩৮. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'মেয়েদের উপন্যাস মেয়েদের কথা', 'কাহাকে থেকে সুবর্ণলতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৪৩।
৩৯. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৩৬।
৪০. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ১৪৯।
৪১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৯৭।
৪২. তদেব, পৃষ্ঠা ১০০।
৪৩. সরকার, পুলককুমার, 'শুভশ্রী', পৃষ্ঠা ২৪।
৪৪. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৮৪৭।

৪৫. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ২৫২।

৪৬. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'কাহাকে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৪।

৪৭. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী ১৮০০০১, পৃষ্ঠা ৫০।

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৫১।

৪৯. মুখোপাধ্যায়, প্রণবকান্তি, 'রবিঠাকুরের মা', নাথ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৮৮।

৫০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর সম্পাদিত, 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৮।

৫১. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১১৪।

৫২. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৫১।

৫৩. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'মেয়েদের লেখালেখি', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১৪৭।

৫৪. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ২৩।

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮।

৫৬. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৬৪।

৫৭. চৌধুরানী, সরলাদেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা', রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫৭।

৫৮. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'রচনা সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৬৮।

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৫১৫।

৬০. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৩৩।

৬১. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৫৯।

৬২. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৩৩।

৬৩. চৌধুরানী, সরলা দেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা', রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৬০।

৬৪. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'মেয়েদের লেখালেখি', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১১৪।

৬৫. বেগম, মালেকা, 'বাংলার নারী আন্দোলন', দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা ৩৯।

৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৭১।

৬৭. চৌধুরানী, সরলা দেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা', রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৮।

৬৮. বেগম, মালেকা, 'বাংলার নারী আন্দোলন', দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা ৭০।

৬৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৭১।

৭০. গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা ২৬।

৭১. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ১০১।

৭২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'রচনা সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১৫।

৭৩. বেগম, মালেকা, ‘বাংলার নারী আন্দোলন’, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা ৭০।
৭৪. শাশমল, পশুপতি, ‘স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য’, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ৭৮।
৭৫. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৫৫।
৭৬. চৌধুরানী, সরলা দেবী, ‘জীবনের ঝরাপাতা’, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১০১।
৭৭. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৪৪।
৭৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭।
৭৯. তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।
৮০. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৩, পৃষ্ঠা ২৯৮।
৮১. ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৯৫৬।
৮২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৭০।
৮৩. চৌধুরানী, সরলা দেবী, ‘জীবনের ঝরাপাতা’, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৮।
৮৪. ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৯৪৯।
৮৫. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৯৩।
৮৬. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৩০।
৮৭. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১০৬।
৮৮. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১৬।
৮৯. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৫২।
৯০. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১৭।
৯১. তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৩।
৯২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৭।
৯৩. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৫৫।